ভিক্ষা চাই না গল্পকাররা বরং কুকুরটাকে বাঁধুন

নীলাদ্রী রায়

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

গল্প নেই। গল্পেরা হারিয়ে গিয়েছে। অন্তত কলকাতাবাসী, কলকাতা-কেন্দ্রিক, কলকাতা - ভরসা ও কলকাতামুখী লেখকের লেখকদের কলমের ডগা কিংবা কম্পিউটরের বোতাম থেকে টুপি খুলে পেন্নাম ঠুকে গল্পেরা বিদায় নিয়েছে। গাদা গাদা পত্রিকা বেরচ্ছে। কয়েকটির গায়ে বড় প্রতিষ্ঠানের তক্‌মা, অধিকাংশ লিট্‌ল ম্যাগাজিনের তবকে মোড়া। পাতা ওলটালেই চেনা - অচেনা নানা মুখের সারি ও নতুন কচি মুখ, পোড়খাওয়া মুখ, কোথাও উদ্ধত, কোথাও ভাঁজ পড়া কপাল। বইমেলা আছে, পুরস্কার আছে ।শীত পড়লে উত্তর কলকাতা সাউথ ক্যালকাটা জেলা সদর- মফস্বল গঞ্জে ঘুরে ঘুরে গল্প পাঠ আছে। আছে ইগোর লড়াই, মান অভিমান ।কলেজ স্ট্রিটে প্রকাশকের ঘরে ডাবের জল, দইয়ের ঘোলে বচ্ছরকার পয়লা বৈশাখ আসে যায়। হই- হুল্লোড়ে বই বেরয়। সপ্তাহে কাগজে কাগজে বের হয় ছোট গল্পের সমালোচনা। পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়--- ব্যাতিক্রমী লেখক, উযদীয়মানলেখক, নতুন প্রজন্মের লেখকের গল্প সংকলন প্রকাশিত হইল। না পড়িলে জীবন বরবাদ। কিন্তু গল্প কই ? কোথায় গেল সেই সব গল্প যারা রাতে জাগায়, দিন স্বস্তি দেয় না। আবর্জনা ঘাঁটতে ঘাঁটতে আচমকা যেমন হারিয়ে ফেলে প্রিয় জিনিসের দেখা মেলে, তেমন কখনও- সখনও পত্রিকার পাতায় দেখা দেয় কোনও গল্প। কিন্তু তার ওপর দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো নতুন করে আবার একরাশ জঞ্জাল এসে পড়ে, চোখের সামনে খোয়াতে হয় তাকে। বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায় লেখকের নাম, গল্পের শিরোনাম, গল্পটুকু মনের কোনাতে জায়গা করে নেয়।

কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা তো হয় কালেভদ্রে। বরং ছাইপাঁশের গাদায় মিইয়ে যায় হঠাৎ পাওয়ার আনন্দ। নতুন পথে আর পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না ।উল্টোমুখে উজান বাওয়ায় বরং মনে ফের রঙ লাগে --- সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবাসিরাজ, অসীম রায়, সমরেশ বসু, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর , অমিয়ভূষণ মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ যোষ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, প্রভতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ঘুরে ফিরে ররীন্দ্র ঠাকুর ....
অথচ গল্পেরা কি সত্যিই হারিয়ে গিয়েছে? জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত এক-একটি নিটোল গল্পের বীজই বপন করে চলে যেন। এক চিলতে ভাবনা থেকে কতশত হয়তো ডানা মেলে প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্তে। গল্প তো আমাদের অস্তিত্বে ছায়ার মতো সেঁটে থাকে। দরকার শুধু সেই শিল্পীর, যে তাকে সেঁচে তুলবে। সে হবে ফরিস্তা, তারযাদু আয়নায় অটকে যাবে চলিষ্ণু জীবনের একটুখানি...মুখ বাড়িয়ে তা দেখলে মিলবে লোকোত্তরে পৌঁছে যাওয়ার অনুভূতি।

কিন্তু তা মেলে কই? ঘুবে ফিরে একই বিষয়বস্তু। হয় মধ্যবিত্ত টানাপোড়েন, দাম্পত্য - বিলাপ, ত্রিকোণ পরকীয় রসভার প্রেম, নয়তো রাজনীতি - সুবাসিত মুষ্টিযোগে। এখন কেউ কথাশিল্পী নন, সকলেই কথা তবলিয়া --হাতের কসরৎ দেখাতে ব্যস্ত। কেউ কেউ বোধহয় আবার কথা বিজ্ঞানী হওয়ার তাগিদে অনুভব করেন। ফলে তাঁদের লেখায় গল্প হয়ে দাঁড়ায় ডাক্তারির ছাত্রদের সাতবেষ্টে মড়া। ফলে তাঁদের লেখায় গল্প হয়ে দাঁড়ায় ডাক্তারির ছাত্রদের সাতবেষ্টে মড়া। কাটা-

ছেঁড়ায় তাকে চেনা দায়। গল্প নয়, এখন ---আওয়াজ না-গল্পের। বিনির্মানের বড়াই গল্পকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে উদ্যত। গল্পেরা তাই নিদ্দিষ্ট ।হাত বাড়ালে তারা দেখা দেয় না ...টিভি সিরিয়াল গিলে খেতে আসে।

একটা কথা মাঝেমধ্যেই তার্কিকদের আলোচনায় ওঠে, তা হল লেখকের দায়বদ্ধতা। গল্প কী, গল্প কাকে বলে, লেখকের কী করা উচিত, কতটা কীভাবে পাঠকের সামনে হাজির করা উচিত ইত্যাদি নিয়ে নানারকমের দফাওয়ারি আলোচনা যুক্তিতক্কো ঘুরে পাক খায় পত্রপত্রিকা, বিতর্কসভ, আড্ডা, চায়ের টেবিলে । গল্পকারদের থাকে এক-একটা ঘোঁট, আলাদা আলাদা দল, ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশনা কিংবা পত্রিকা - নির্ভর। এক দল আরেক দলের মুন্ডপাত করে -কার গল্প সরেস তাই নিয়ে যেন হাতাহাতির উপত্রম হয়। গল্পের জাতবিচার করতেই পেকে যায় অনেকের চুল। আর এ সবের ফাঁক গলে গল্প পালায় দূরে ...অ-নে-ক দূরে...।

আজকের সময়ের যার অভাব সব থেকে বেশি, তা হল স্টোরিটেলার -এর ।এখন যাঁরা লেখেন, তাঁরা ভেবে দেখবেন ---কেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তাঁর পর সত্যজিৎ রায় এখনও এত জনপ্রিয়, ছেলে-বুড়ো সকলের কাছে? এর একটাই----কারণ---তাঁর আগাগোড়া গল্প বলেন। শুরু থেকেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সত্যজিৎ রায়ের গল্পেয় মধ্যে ঢুকে যায়। শেষ করেও তার রেশ কাটেনা। পড়তে পড়তে মাঝিখানে থেমে বই রেখে আড়মোড়া ভাঙতে হয় না। উল্টে পড়ার মাঝপথে ব্যাঘাত ঘটলে মন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বারবার পড়লেও পুরনো হয় না প্রেমেন্দ্র মিত্র-র তেলেনাপোতা আবিষ্কার কিংবা সুবোধ ঘোষেরশ্মশানচাঁপা। আর এখন ? একটা গল্প একবার পড়ে ভাল হয়েতো লাগল ; কিন্তু ওই পর্যন্তই । দ্বিতীয়রার ফিরে পড়ার সাধ আর জাগে না । কিন্তু শরদিন্দু-র রক্তসন্ধ্যা প্রথমবার পড়ার পর চবিবশ ঘন্টাও কাটেনি --- দ্বিতীয়বার পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।

******

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে --মধ্যাহেও বৃষ্টির বিরাম নাই, কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই। (জীবিত ও মৃত)

লেজা এবং মুড়া , রাহু এবং কেতু, পরস্পরের সঙ্গে আড়াতাড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেইরকম। প্রাচীন হালদার বংশ দুই খন্ডে পৃথক হইয়া প্রকান্ড বসতবাড়ির মাঝকানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিটাপিটি করিয়া বসিয়া আছে, কেহ কাহারও মুখ দর্শন করে না।
(ফল)
একই লেখকের দুইটি গল্পের লেজা এবং মুড়া । সেই লেখক যাঁর মৃত্যুই হয়েছে ১৯৪১ সালে । জীবিত ও মৃত যখন লেখা তখনও ১৩০০ বঙ্গাব্দের সূচনা ঘটেনি। বিংশ শতাব্দী অদূরবর্তী নয় বটে, তবে একেরারে হাত বাড়ালেই ছোঁয়ার মতো নাগলের মধ্যেও নয়। ফেল রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৩০৭-এ, বিংশ শতাব্দীর সদ্য সূচনায়। কী অদ্ভুত! এই ২০০৩ -এও না - গল্পের ভুলভুলাইয়ার ঘুর পাক খাওয়া মন ফের সেখানেই পৌঁছে স্বস্তি পায়। গল্পের চরিত্রগুলি সজীব হয়ে চলতে - ফিরতে শুরু করে ।মন ভাল না থাকলে কিংবা অস্থির হয়ে উঠলে গল্পগুচ্ছ - ই তার আশ্রয়ে টেনে নেয়। রবীন্দ্রনাথের গান কিংবা কবিতার মতো সেও যেন মায়ের প্রসন্ন কোল।

শেখভ নাকি হইচই -গন্ডগোল ছাড়া লিখতে পারতেন না। তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণে এসে বন্ধুরা সমোভারের চা খেতে খেতে চুটের ধোঁয়া আর বক-বকানিতে গুলজার করে তুলত, শেখভ তখন ঘরের এককোণে চেয়ার টেনে নিয়ে লিখতে বসতেন --- ডেথ অফ এ ক্লার্ক, ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স, দ্য লেডি উইদ দ্য ডগ...। সেই শেখভ, যিনি লিখেছিলেন ----জ্যোৎস্না সবাই দেখে, লেখক দেখে ভাঙা বোতলে পিছলে --যাওয়া চাঁদের আলোটুকুও। শেখভ জীবনকেএকভাবে দেখছেন, রবীন্দ্র নাথ একভাবে, মোপাসাঁ আরেক ভাবে, কাফকার দেখাটা ভিন্নরকম ---কিন্তু সব দেখার মধ্যেই জীবনের

গন্ধটা ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়। জীবনের ওঠাপড়ায় অন্তরাত্মার গহনে তাঁরা বহির্বিশ্বের স্পন্দনকেও আবাহন করতে পেরেছিলেন। তাই না তাঁরা কালজয়ী ! মোপসোঁ যেতেন বলেই পতিতালয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরেতো আর তাঁর মতো লেখক হওয়া যায় না । শুধু রোগাক্রান্তই হতে হয়।

এডগার অ্যালান পোর দিনরাত কাটত মদ - জুয়ার আড্ডায়, জ্যাক লন্ডন ছিলেন ----নাবিকের দঙ্গলে, শলোখভেরবহু রাত ভোর হয়েছে রনক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে,মর্টার আর মেশিনগানের গুলির শব্দে। জীবনের তাগিদই তাঁদের তাড়িয়েনিয়ে বেড়িয়েছে অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ঘাটে। কাগজ কলম দিয়ে অভিজ্ঞতাকে গল্পকারের জবান বন্দী করবেন ভেবে আটঘাট বেঁধে বিপন্ন হননি। নিজেকে বিপন্ন করো, না হলে লেখা হবে না ---- এরকম কোনও দার্শনিক সিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে তাঁরা লিখতে নামেননি। বিপন্নতা এসেছে তাঁদের জীবনের আপন বেগে, পাহাড় থেকে সমতলে নামা নদীর মতো প্রচন্ড ও প্রকৃতিক অনিবার্যতায়, লেখাও বেরিয়ে এসেছে অন্তঃস্থলের তাড়না থেকে।

অন্তর্দৃষ্টি আর সংবেদনশীলতার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আর লেখকের নিজস্ব সহজাত মুন্সিয়ানা মিশলে তবেই না গল্প। তাতে অনেক ..না-গল্প.. ও গল্প হয়ে দাঁড়ায় ম্যাক্সিম গোর্কির মানুষের জন্মর মতো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বউ সিরিজও তো এরকম না-গল্পেরই সাতনরী হার।

কেরানীর বউ-এর সরসী স্বমীর নির্দেশ অমান্য করে খোলা ছাদে উঠেছিল। কাপড় শুকতে দিয়ে চট করে সে নেমে আসেনি। দুচোখ ভরে ছাদ থেকে বাইরের দুনিয়াটা সে দেখেছিল। স্বামীর নির্দেশ অমান্য করে তাতেই মুক্তির আনন্দ পেয়েছিল সে। একইসঙ্গে তার হয়েছিল এক অদ্ভুত অনুতাপ----

“ দুই করতল সজোরে ছাদে ঘষিতে ঘষিতে জোরে জোরে বলিতে লাগিল----
“ বেশ, বেশ, বেশ! আমার খুশি! আমরা খুশি আ-মা-র খুশি !
“ তারপর শূন্যের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিয়ে শূন্যকেই সম্বোধন করিয়া আবার বলিল, হল তো ?...
“ সরসীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।”

পড়তে পড়তে আমার চোখে বারে বারে বাষ্প জমে।
এ লেখা আগামী দিন যদি কেউ পড়েন, তাহলে সমারসেট মমের দ্য পোয়েট গল্পের ভাষায় তাঁর মনে হতে পারে, হয়তো অনুকম্পাও হতে পার এই ভেবে যে... “in a world unsympathetic to Byronism he had led a Byronic existence…” । কিন্তু আমি কোনও সাহিত্য বিচার করতে বসিনি। পাঠক হিসাবে আমার শুধু একটাইজানতে চাওয়া ঃ রবীন্দ্রনাথ, শরদিন্দু কিংবা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা গল্প বারবার পড়েও শান্তি হয় না, নতুন কিংবা সমসাময়িকদের লেখা গল্প প্রথমবার পড়তে বসেই ক্লান্তি আসে কেন?

জীবননন্দ দাশের লেখা গল্পগুলির বিষণ্ণতা এক সময় এক ঘেয়ে লাগতে শু করে। তবু কোনও কোনও গল্প স্তম্ভিত করে দেয়। যেমন মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে। টিম্বার ব্যবসার সুত্রে অসমের নির্বান্ধব জঙ্গলে পড়ে থাকা চারটি মানুষের দিনযাপন। গল্পে কোনও নারী চরিত্র নেই। নারী সান্নিধ্যের কী প্রচন্ড আকুলতা। অথচ তার পষ বহিঃপ্রকাশওনেই। তবু গোটা গল্পে পাকে পাকে জড়িয়ে রয়েছে মেয়ে মানুষের ঘ্রাণ। নারীর দেখা নেই, বন্য ভিজে প্রকৃতির পরিপার্শ্ব, চার পুযের আপাত অসংলগ্ন আলাপ চারিতায় সে কারণেই নারী যেন ভীষণ, ভীষণ ভাবে আছে, লেখক, গল্পের চরিত্র চতুষ্টয় এবং পাঠক -- সকলের স্নায়ুই তাই প্রখর, সতর্ক, সজাগ, টানটান....।

একইভাবে হতবাক হতে হয় ননী ভৌমিকের ধানকানা গল্প সংগ্রহ শেষ করার পর। সমাজের বিভিন্ন ধাপে লাট- খাওয়া

বিচিত্র জীবনই সেখানে গল্পের উপজীব্য, গল্পই জীবন----

“ চান কর‍্যা আলাম ওই ডোবাডায়, নমোদের অসুখ তো বালো হয় শুনি, আমার হোবে না ক্যানে?
“জাহান্নামের কালো আগুন থেকে আর্ত প্রশ্ন করলে এন্তাজ।”
(কাফের)
‘সংগ্রামী’ লেখকদের বলি --এর কার্বন কপি করার ব্যর্থ চেষ্টা আর করবেন না। অন্য কিছু ভাবুন।

*****

আমাদের জীবনে এমনিতেই একটা বড় খামতি হল -- আমরা যুদ্ধ দেখিনি, যুদ্ধের আগুনের মধ্যে পড়া যাকে বলে,পড়িনি। দুর্ভিক্ষ এসেছে, মারী নিয়ে ঘর করেছি, দাঙ্গায় পুড়ছি, দেশ ভাগে হৃৎপিন্ডদু-ভাগ হয়েছে। কিন্তু নগ্ন নির্মম যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েনি ।উনিশশ একাত্তরে ওপার বাংলায় যা ছিল দুঃস্বপ্ন ঘেরা আতঙ্ক, রক্তঝরা বাস্তব, এপার বাংলায় তা ছিল নিছক সংবাদমাত্র। যুদ্ধ অবশ্যই আবাহন করছি না। মানুষের জীবনে তার মতো ভয়ঙ্কর ছাপ তো আর অন্যকিছু ফেলে না। কিন্তু যুদ্ধ বোধহয় জীবনকে একটু অন্যভাবে দেখতে শেখায়। সাহিত্য তার আগুনে পুড়ে ইস্পাত হয়ে ওঠে। প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ --- কোনওটারই প্রত্যক্ষ প্রভাব কলকাতায় পড়েনি।হাতিরাগনে জাপানি বোমা পড়া ছাড়া। ছোট গল্পের ধারাতেও কি তাই তেড়েফুঁড়ে ওঠার আস্তেআস্তে নেতিয়ে পড়া ? এখন খালি গ্যাঁজলা ছাড়া যে কারণে আর কিছুই উঠছে না? এমনকি ভয়ঙ্কর যে দেশভাগ, তা নিয়েও সদাও সদাত হুসন মন্ঠো-র লেখা টোরাটেক সিং-এর মতো গল্প কলকাতায় বাঙালি লেখকদের কলমে কোথায়?পরবর্তীকালে নকশাল আন্দোলন নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়েছে। কিন্তু খোদ সেই আন্দোলনের মতো, গল্পগুলিরও পা জমিতে না থেকে আকাশ লগ্ন হওয়ায় বিস্মৃতিতে তলিয়ে গিয়েছে। ব্যাতিক্রম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ওরা তিনজন এবং অনুসরণকারী।

তবু এই পোড়া দেশের মাটিতে এমন রস হয়তো ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম কোঠা ইস্তক সমাজ জীবনে ও সাহিত্য- স্রোতস্বিনীতে যখনই এক-একটা ঢেউ এসেছে, তখন সেখানে একাধিক অমর গল্পকার আমরা পেয়ে গিয়েছি, গল্পেরা মনে দাগ কেটে বসে গিয়েছে, গল্পকারও চিরজীবী-চিরযুবা হয়ে রয়ে গিয়েছেন ---- কমলকুমার মজুমদার তাঁর আমোদ - বোষ্টুমী-র সঙ্গে, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার অশ্বমেধে ঘোড়া কিংবা জটায়ু-র সঙ্গে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ---এখন কি কেউই এমন লেখা লিখছেন না যা পড়া যায়? নিশ্চয়ই লিখছেন ---বিশেষ করে দু-একজন মহিলা-লেখক, যাঁদের লেখা মহিলা বলে আলাদা ফিলিংস নিয়ে পড়তে হয় না, লেখা হিসাবেই পড়তে হয়। য়েমন - বাণী বসু। গল্প পড়লে হঠাৎ চমক লাগে, অচেনার আনন্দ জাগে মনে ---আফসার আহমেদ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী কিংবা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো দেখা মেলে আরও কারও কারও। কিন্তু কঠিন, কঠোর হলেও বাস্তব---এঁদের কারও গল্পগ্রন্থই পয়সা দিয়ে কিনে ঘরে রাখব না। সে টান জাগে না

কলকাতায় যাঁরা এখন গল্প লিখছেন তাঁদের উপদেশ দিচ্ছি না, সামান্য শুধু -পাঠক হিসাবেই অনুরোধ করছি ---জীবনকে দেখুন, নিজের চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে দেখুন। কামতাপুরী বা জনযুদ্ধ জঙ্গী বলে দাগিয়ে দেওয়া ঘরছাড়া যুবকের অজগাঁ-বাসী মায়ের গল্প কই, কই কেশপুরের ঘরছাড়াদের বিরহ - বেদনার গল্প, অরক্ষিত সীমান্তে সীমান্তেবিনিদ্র জীবনযাপনের গল্প কোথায়, কোথায় পাচারকারীদের হাত বদল হতে থাকা মেয়েদের গল্প? হঠাৎ বন্ধ কারকানার নোটিস লটকানো গেট থেকে বাড়ি না ফিরে সটান রেল লাইনের দিকে পাড়ি দেওয়ার গল্প ? ডুয়ার্স থেকে শালবনী ইস্তক যে ডাইননিপীড়ন --- মহাশ্বেতা দেবীর ক্লান্তিকর গন্ডীর বাইরে গিয়ে তার গল্পই বা কই ?নেই দুপা দূরের সুন্দরবন কিংবা সাগর-উপকূলের ধীবরজীবনের গল্প। যা-ও বা টুকটাক মিলেছে, সেই ভিডিও-মার্কা গল্প পড়তে পড়তে অচি ধরে

গেছে। গল্প কিন্তু আছে, সদ্য-পরিচিতা সুন্দরীকে চুমু খেতে না-পাবার দীর্ঘ্বাস, শাসকগোষ্ঠীর আশীর্বাদ কিংবা মোটা টাকার সাহিত্য পুরস্কার না পাওয়ার হতাশাকে দূরে সরিয়ে রেখে---আপনারা বরং তারপায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়ুন। আমরা আবার আদর করে আপনাদের লেখা পড়ব।

আপনারও পড়ুন। পড়ুন শলোখভের গল্প লেখার গল্প ---দ্য সায়েন্স অফ হেট্রেড। ৩২ বছরের লেফটেন্যান্ট গেরাসিমতের জীবন কাহিনীর একটা টুকরো। যার স্ত্রী স্বামীর যুদ্ধযাত্রার সময় বিদায় দিতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কথা না খুঁজে পেয়ে বলে ঃ / বিত্তর লক্ষ্মীটি, ঠান্ডা লাগিয়ো না যেন?” যে গল্প লেখার গল্প শু হয়ে---In war, trees –like people- all have their own fate. কী অনায়াস, অথচ কী অসাধরণ উচ্চারণ ! পড়তে পড়তেই যেন স্পষ্ট বোঝা যায় ----কোথায় কোনখান্টায় আমাদের এখনকার কলকওাই লেখকদের ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তে পড়তে মনে হয়----দোলনায় দুলছি। শরদিন্দু পড়তে পড়তে মনে হয়---কেউ চাপিয়ে দিয়েছে সেই বিদ্যুৎ চালিত নাগরদোলায় ---আস্তে আস্তে ঘুরতে শু করার পর যা ত্রমশ দমবন্ধ করে দিতে থাকে, অথচ একই সঙ্গে শিরায় -উপশিরায় রক্তের কল্লোল মেতে ওঠে এক অদ্ভুত আনন্দে, সুখানুভুতিতে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা পড়লে মনে হয় ----হঠাৎ কোনও অচেনা স্টেশনে নেমে পড়ে মনের আনন্দে ঘুরছি এ রাস্তায়, সে রাস্তায়। এখনকার অধিকাংশ লেখা পড়লে মনে হয়--- কেউ যেন স্দ্য ইটের টুকরো ফেলা রাস্তায় অনন্ত যাত্রায় চাপিয়ে দিয়েছে ভ্যান-রিকশায়, নামলে পরে শান্তি মেলে।

সামান্য পাঠকের অনুরোধটুকুতে কান না দিয়ে আপনারা যদি ফেঁদে চলতে থাকেন সেই সব বস্তাপচা প্রেম আর নাটকীয় গল্প, পড়তে ভাল না লাগলেও যা নিয়ে টেলিভিসন সিরিয়ালের প্রযোজক পরিয়ালক টেনেটুলে একটা ফিলিম খাড়া করে দেবে, তাহলে আপনাদের জন্য গোর্কির সেই কঠোর উচ্চারণ ছাড়া আর কী-ই বা বরাদ্দ থাকে ঃ Same dlits, someone publishes these tons of verbal waste, some irresponsible people praise the output at these irresponsible botchers, obviously praising, them because they don’t know better or they have personal reasons.

সত্যি বলতে কী ---বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ থেকে শু করে মেরেকেটে আটের দশক অবধি কলকাতার লেখকদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে তা - ই যথেষ্ট, তার পরের গল্প আর না পড়লেও চলে যায়। অন্তত কী যে হারালাম --এ রকম কোন দুঃখ মনে জাগে না। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবী নিধন পালা-র গল্প শেষ ---অগ্নিবর্ণ ঋতুর পালাটি এখানেই শেষ।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home